بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৫ নভেম্বর, ২০২২ মোতাবেক ২৫ নবুয়্যত, ১৪০১ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেনঃ

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র জীবনচরিতের বিভিন্ন দিক বর্ণিত হচ্ছিল। এ প্রসঙ্গে তাঁর সৃষ্টিসেবা এবং অভাবীদের আহার করানো ইত্যাদি সম্পর্কে জানা যায় যে, ইসলামগ্রহণের পূর্বেও হযরত আবু বকর (রা.) কুরাইশদের সর্বোত্তম ব্যক্তিবর্গের মাঝে গণ্য হতেন এবং যে কোন সমস্যায় নিপতিত হলেই লোকেরা তাঁর কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণ করত। মক্কায় তিনি প্রায়শই অতিথি আপ্যায়ন করতেন এবং বড় বড় ভোজের আয়োজন করতেন। অজ্ঞতার যুগে হযরত আবু বকর (রা.)-কে কুরাইশের নেতৃস্থানীয় এবং তাদের অভিজাত ও সম্মানিত লোকদের মাঝে গণ্য করা হতো। হযরত আবু বকর (রা.)-কে সেই সমাজে কুরাইশের অভিজাত লোকদের মধ্যে গণ্য করা হতো আর (তিনি) সর্বোত্তম মানুষদের মাঝে গণ্য হতেন। লোকেরা তাদের বিপদাপদ এবং বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর শরণাপন্ন হতো। মক্কায় অতিথি আপ্যায়নের ক্ষেত্রে তিনি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন।

এছাড়া লিখিত আছে, হযরত আবু বকর (রা.) দরিদ্র এবং মিসকিনদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন। শীতকালে কম্বল ক্রয় করে সেগুলো অভাবীদের মাঝে বিতরণ করতেন। একটি রেওয়ায়েতে আছে, হযরত আবু বকর (রা.) এক বছর গরম চাদর ক্রয় করেন, অর্থাৎ গ্রাম থেকে আনা কম্বল ক্রয় করেন এবং শীতকালে মদীনার বিধবা নারীদের মধ্যে এসব চাদর বণ্টন করা হয়।

একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, খিলাফতের আসনে সমাসীন হওয়ার পূর্বে তিনি একটি সহায়-সম্বলহীন পরিবারের জন্য ছাগলের দুধ দোহন করতেন। তিনি খলীফা (নির্বাচিত) হওয়ার পর সেই পরিবারের ছোট্ট একটি মেয়ে বলে, এখন তো আর আপনি আমাদের ছাগলের দুধ দোহন করবেন না। একথা শুনে হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, কেন করব না? নিজ প্রাণের কসম! আমি অবশ্যই তোমাদের জন্য (দুধ) দোহন করব; আর আমি আশা রাখি, আমি যে দায়িত্ব গ্রহণ করেছি তা আমার এই অভ্যাসে বাদ সাধবে না। অতএব পূর্বরীতি অনুযায়ী তাদের ছাগলগুলোর দুধ তিনি (রা.) দোহন করতে থাকেন। সেই মেয়েরা যখন তাদের ছাগলগুলো নিয়ে আসত তখন তিনি স্নেহের সাথে বলতেন, দুধের ফেনা তৈরি করব, না কি করব না? তারা যদি বলত, ফেনা তৈরি করে দিন, তাহলে তিনি পাত্রটি সামান্য দূরে রেখে দুধ দোহন করতেন, ফলে অনেক ফেনা হতো। কিন্তু যদি তারা বলত, ফেনা বানাবেন না, তখন পাত্রটি ওলানের কাছে রেখে দুধ দোহন করতেন যেন দুধে ফেনা না হয়। তিনি (রা.) লাগাতার ছয় মাস পর্যন্ত এই সেবা প্রদান করতে থাকেন, অর্থাৎ খিলাফত লাভের ছয় মাস পর পর্যন্ত। এরপর তিনি মদীনায় বসবাস করতে আরম্ভ করেন। প্রথমে হযরত আবু বকর (রা.)'র দুটি বাড়ি ছিল। একটি বাড়ি (মদীনার) বাইরে ছিল, মহানবী (সা.)-এর যুগে সেখানে বসবাস করতেন; কিন্তু মহানবী (সা.) মসজিদে নববীর নিকটে নিজ বাড়ি সংলগ্ন একটি জমি তাঁকে দান করেছিলেন, সেখানেও তিনি বাড়ি বানিয়েছিলেন। এছাড়াও একটি

বাড়ি ছিল, মদীনায়ও দুটি বাড়ি ছিল। কিন্তু পূর্বে মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় তিনি অধিকাংশ সময় শহরতলীতে যে বাড়ি ছিল সেখানেই থাকতেন। পরবর্তীতে খলীফা হওয়ার পর মদীনায় স্থানান্তরিত হন। মদীনায় না আসা পর্যন্ত তিনি (রা.) সেই মেয়েদের (ছাগলের দুধ দোহনের) যে দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে তুলে নিয়েছিলেন তা পালন করতে থাকেন।

হযরত উমর (রা.) মদীনার (এক) প্রান্তে বসবাসকারী এক বৃদ্ধা ও অন্ধ মহিলার দেখাশোনা করতেন। তিনি তার জন্য পানি আনতেন এবং তার কাজকর্ম করে দিতেন। একবার তিনি তার বাড়িতে গেলে বুঝতে পারেন যে, তাঁর পূর্বে কেউ এসেছিল যে এই বৃদ্ধার কাজকর্ম করে দিয়েছে। পরের বার তিনি সেই বৃদ্ধার বাড়িতে তাড়াতাড়ি যান যেন অন্যজন আগে আসতে না পারে। হযরত উমর (রা.) লুকিয়ে বসে থাকেন এবং দেখতে পান যে, তিনি হযরত আবু বকর (রা.) যিনি ঐ বৃদ্ধার বাড়িতে যেতেন, অথচ তখন হযরত আবু বকর (রা.) খলীফা ছিলেন। এটি দেখে হযরত উমর (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! এমন (মানুষ) কেবল আপনিই হতে পারেন। অর্থাৎ এই পুণ্যকাজে আমাকে ছাড়িয়ে যেতে কেবল আপনিই পারেন।

একটি রেওয়ায়েত রয়েছে, মূসা বিন ইসমাঈল বর্ণনা করেছেন, মু'তামের তার পিতার বরাতে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, আবু উসমান আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, হযরত আব্দুর রহমান বিন আবু বকর (রা.) তাকে বলেছেন, সুফ্ফাবাসীরা অভাবী ছিলেন। একবার মহানবী (সা.) বলেন, যার কাছে দুজনের খাবার রয়েছে সে তৃতীয় ব্যক্তিকে নিয়ে যাবে এবং যার কাছে চারজনের আহার আছে সে পঞ্চম বা ষষ্ঠ ব্যক্তিকে নিয়ে যাবে, কিংবা এমনই কিছু শব্দ বলেছেন। অর্থাৎ লোকেরা যেন সেসব দরিদ্র মানুষকে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে খাবার খাওয়ায় যারা (সেখানে) বসে ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) তিনজনকে নিয়ে আসেন এবং মহানবী (সা.) দশজনকে নিয়ে যান। তাঁর বাড়িতে হযরত আবু বকর (রা.) এবং আরো তিনজন (আগে থেকেই) ছিলেন; হযরত আব্দুর রহমান বলতেন, আমি এবং আমার বাবা ও আমার মা। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জানি না আব্দুর রহমান একথাও বলেছিল কি না যে, আমার স্ত্রী বা আমার সেবক যে আমার ও হযরত আবু বকর (রা.) উভয়ের বাড়িতেই কাজ করত। আর (ঘটনাটি) এমন হয় যে, হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর বাড়িতে রাতের খাবার খান, এরপর সেখানেই অবস্থান করেন আর ইশার নামায পড়ার পর ফিরে আসেন। {আবু বকর (রা.)} অতিথিদের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু এরপর মহানবী (সা.)-এর কাছে ফিরে আসেন এবং অবস্থান করেন আর সেখানেই (রাতের) খাবার খান। (বর্ণনাকারী) বর্ণনা করেন, সেখানে এতক্ষণ অবস্থান করেন যে, মহানবী (সা.)-এর বাড়িতেই তিনি রাতের খাবার খান এবং রাতের এতটা সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর (নিজের বাড়িতে) আসেন যতটা আল্লাহ্ চেয়েছেন। তাঁর স্ত্রী তাঁকে বলেন, কী এমন কাজ ছিল যা আপনার জন্য অতিথিদের, (বা তিনি বলেন,) অতিথির কাছে আসতে বাদ সাধছিল? অর্থাৎ, আপনি এত দেরি করেছেন কেন? হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, তুমি কি তাদেরকে খাবার খাওয়াও নি? তিনি বলেন, তারা আপনার না আসা পর্যন্ত খাবার খেতে অসম্মতি জানিয়েছিলেন। অতিথিরা বলেছিলেন, আবু বকর (রা.) না আসা পর্যন্ত আমরা খাবার খাব না। তিনি তো তাদেরকে খাবার পরিবেশ করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী বলেন, আমি তাদেরকে খাবার পরিবেশন করেছিলাম; কিন্তু অতিথিরা তার কথা মানেন নি। হযরত আব্দুর রহমান বলতেন, আমি এই ভয়ে লুকিয়ে থাকি যে, পাছে হযরত আবু বকর (রা.) আমাকে ধমক

দিয়ে বলে না বসেন যে, অতিথিদের খাবার খাওয়াও নি কেন? আব্দুর রহমান বলতেন, হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, 'আরে বোকা!' এবং তিনি আমাকে চরম অলস বলেন। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) অতিথিদের বলেন, আপনারা খাবার খান; এবং স্বয়ং আবু বকর (রা.) কসম খান যে, আমি কিছুতেই (খাবার) খাব না। হযরত আব্দুর রহমান বলতেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমরা যে গ্রাসই মুখে দিতাম এর নীচে (থালায়) তার চেয়েও বেশি খাবার হয়ে যেত। আর তারা এতটা খাবার খান যে, পরিতৃপ্ত হয়ে যান। কিন্তু (খাবার) পূর্বে যতটা ছিল তার চেয়েও (পরিমাণে) বেড়ে যায়। অতিথিদের খাবার খাওয়ান, তারা খাবার খেয়ে যাচ্ছিলেন; কিন্তু বলেন, খাবার ততটাই রয়ে যেত বরং আরো বৃদ্ধি পেত, অথচ সবাই পেট ভরে খেয়েছে। হযরত আবু বকর (রা.) যখন দেখেন, খাবার যতটা ছিল ততটাই আছে, বরং পূর্বাপেক্ষা বেশি আছে, তখন তিনি তাঁর স্ত্রীকে বলেন, বনী ফেরাসের বোন, এটি কী? তাঁর স্ত্রী বলেন, আমার চোখের স্নিগ্ধতার কসম! এটি তো পূর্বাপেক্ষা তিন গুণ বেড়ে গেছে। অর্থাৎ খাবার এত পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। হযরত আবু বকর (রা.)-ও সেখান থেকে খান এবং বলতে থাকেন, সে তো কেবল শয়তান ছিল, অর্থাৎ তার (শয়তানের) প্ররোচনায় আমি না খাওয়ার কসম খেয়েছিলাম। [প্রথমে কসম খেয়েছিলেন যে, আমি খাব না। কিন্তু যখন দেখেন, খাবারে বরকত হচ্ছে তখন তিনি বলেন, শয়তান আমার দ্বারা সেই কসম করিয়েছিল; এটি যেহেতু বরকতপূর্ণ খাবার তাই এটি থেকে আমিও খাব।] এরপর হযরত আবু বকর (রা.) তা থেকে এক গ্রাস খান। অতঃপর তিনি (রা.) সেই খাবার নিয়ে মহানবী (সা.)-এর কাছে যান আর তা মহানবী (সা.)-এর কাছে সকাল পর্যন্ত থাকে। [অর্থাৎ খাবার সকাল পর্যন্ত সেখানে থাকে।] তিনি বলেন, আমাদের ও এক গোত্রের মাঝে একটি চুক্তি ছিল যার মেয়াদ অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। সেই (গোত্রের) বারো ব্যক্তিকে আমরা পৃথক পৃথক বসাই আর তাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকের সাথেই কয়েকজন লোক ছিল, অর্থাৎ সেই চুক্তিবদ্ধ লোকদের (মধ্য থেকে) বারো জন ছিল আর প্রত্যেকের সাথে আরো কয়েকজন ছিল। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে কতজন করে লোক ছিল, তবে এতটুকু নিশ্চিত যে, তিনি (সা.) সেই লোকগুলোকে মানুষজনের সাথে পাঠিয়েছিলেন; [অর্থাৎ তারা উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় ছিল।] হযরত আব্দুর রহমান বলতেন যে, তারা সবাই সেই খাবার থেকে খায়, অথবা অনুরূপ কিছুই বলেছিলেন। অতএব এরূপ বরকত আল্লাহ্ তা'লা একবার হযরত আবু বকর (রা.)'র খাবারেও দান করেন।

হযরত আব্দুর রহমান বিন আবু বকর (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি আছে যে আজ কোনো দরিদ্রকে খাবার খাইয়েছে? তখন হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমি মসজিদে প্রবেশ করলে এক ব্যক্তি আমার কাছে (খাবার) চায়, তখন আমি আব্দুর রহমানের হাতে রুটির একটি টুকরো (দেখতে) পাই, যা আমি তার কাছ থেকে নিয়ে নিই আর তা সেই অভাবীকে দিয়ে দেই। অর্থাৎ এভাবে এক অভাবী (খাবার) চেয়েছিল, আমার পুত্রের হাতে রুটি ছিল। আমি তার কাছ থেকে তা নিয়ে সেই অভাবীকে দিয়ে দিয়েছি।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন,

হযরত আবু বকর (রা.)'র পুত্র হযরত আব্দুর রহমান (রা.)-ও খিলাফতের যোগ্য ছিলেন আর লোকজন প্রস্তাবও দিয়েছিল যে, তার প্রকৃতি হযরত উমর (রা.)'র চেয়ে কোমল আর যোগ্যতাও তাঁর চেয়ে কম নয়; আপনার পর তারই খলীফা হওয়া উচিত। কিন্তু হযরত

আবু বকর (রা.) খিলাফতের জন্য হযরত উমর (রা.)-কেই মনোনীত করেন, যদিও হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রা.)'র প্রকৃতিতে ভিন্নতা ছিল। সুতরাং হযরত আবু বকর (রা.) খিলাফত থেকে ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থসিদ্ধি করেন নি, বরং সৃষ্টির সেবার মাঝেই তিনি শ্রেষ্ঠত্ব মনে করতেন।

সুফীদের একটি রেওয়ায়েত রয়েছে। (এ সম্পর্কে) হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন এটি কতটুকু সঠিক! হযরত আবু বকরের মৃত্যুর পর হযরত উমর (রা.) হযরত আবু বকরের ভৃত্যকে জিজ্ঞেস করেন, সেই পুণ্যকর্মগুলো কী কী যা তোমার মনিব করত? (তুমি বল) যেন আমিও সেগুলো করতে পারি। অন্যান্য পুণ্যকর্মের পাশাপাশি সেই ভৃত্য একটি কাজের কথা বলে আর সেটি হলো, হযরত আবু বকর প্রতিদিন রুটি বা খাবার নিয়ে অমুক দিকে যেতেন আর আমাকে এক স্থানে দাঁড় করিয়ে তিনি সামনে চলে যেতেন। আমি এটি বলতে পারব না যে, তিনি কী উদ্দেশ্যে সেখানে যেতেন। এই কথা শোনার পর হযরত উমর (রা.) সেই ভৃত্যের সাথে খাবার নিয়ে সেই (স্থানের) দিকে চলে যান যার উল্লেখ সেই ভৃত্য করেছিল। সামনে গিয়ে তিনি দেখেন, এক গুহায় হাত-পা বিহীন একজন পঙ্গু ও অন্ধ ব্যক্তি বসে আছে। হযরত উমর সেই পঙ্গু ব্যক্তির মুখে খাবারের একটি গ্রাস তুলে দিলে সে কেঁদে ফেলে আর বলতে থাকে, আল্লাহ্ তা'লা আবু বকরের প্রতি কৃপা করুন, তিনি কতই না পুণ্যবান ব্যক্তি ছিলেন! হযরত উমর (রা.) বলেন, বাবা! তুমি কীভাবে জানতে পারলে যে, আবু বকর মৃত্যুবরণ করেছেন? তখন সে বলে, আমার মুখে দাঁত নেই, তাই আবু বকর চিবিয়ে আমার মুখে গ্রাস তুলে দিতেন। আজ আমার মুখে শক্ত গ্রাস আসায় আমি বুঝতে পারি, এই গ্রাস মুখে তুলে দেয়া ব্যক্তি আবু বকর নন, বরং অন্য কোনো ব্যক্তি। এছাড়া আবু বকর কখনো বিরতিও দিতেন না; এখন যেহেতু বিরতি হয়েছে, তাই নিশ্চিতরূপে তিনি এই পৃথিবীতে নেই। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, অতএব সেটি কী এমন জিনিস ছিল যা হযরত আবু বকর রাজত্বের মাধ্যমে অর্জন করেছেন? খিলাফত বা রাজত্ব যা তিনি পেয়েছিলেন তা থেকে তিনি কিছুই পান নি। তিনি কি সরকারী অর্থকে নিজের বলে ঘোষণা করেছেন আর রাষ্ট্রীয় সম্পদকে নিজের সম্পত্তি আখ্যা দিয়েছেন? কখনোই নয়। যেসব জিনিস তাঁর আত্মীয়স্বজন পেয়েছিল তা তাঁর ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে ছিল। তাঁর একমাত্র স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য যা ছিল তা হলো সেই সেবা যা তিনি করেছেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, শরীয়তের দুটি অংশ রয়েছে, হাক্কুল্লাহ্ ও হাক্কুল ইবাদ। এ দুটি জিনিসই রয়েছে, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার প্রাপ্য ও বান্দার অধিকার। তিনি (আ.) বলেন, মহানবী (সা.)-কে দেখ, কীভাবে তিনি সেবামূলক কাজে জীবন অতিবাহিত করেছেন! আর হযরত আলী (রা.)'র অবস্থা দেখ! তিনি (কাপড়ে) এত বেশি তালি লাগিয়েছেন যে আর জায়গা অবশিষ্ট ছিল না। হযরত আবু বকর (রা.) এক বৃদ্ধাকে সবসময় হালুয়া খাওয়ানো অভ্যাসে পরিণত করেছিলেন। লক্ষ্য করে দেখ, এটি কীরূপ অভ্যাস ছিল! যখন তিনি, অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.) মৃত্যুবরণ করেন তখন সেই বৃদ্ধা বলে, আজ আবু বকর মৃত্যু বরণ করেছেন। তার প্রতিবেশীরা বলে, তোমার ওপর কি এলহাম বা ওহী হয়েছে? তখন সে বলে, না, আজ তিনি হালুয়া নিয়ে আসেন নি, তাই বুঝতে পেরেছি তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। অর্থাৎ তাঁর জীবদ্দশায় এটি সম্ভব ছিল না যে, কোনো পরিস্থিতিতেই হালুয়া পৌঁছবে না। দেখ, কীরূপ সেবা ছিল! সবারই উচিত এভাবে সৃষ্টির সেবা করা।

তাঁর দোষত্রুটি ঢেকে রাখার মান কেমন ছিল– এ সম্পর্কে রেওয়ায়েত রয়েছে। হযরত আবু বকর (রা.) বলতেন, আমি কোন চোর ধরলে আমার সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা এটিই হতো যে, আল্লাহ্ তা'লা যেন তার অপরাধ ঢেকে দেন। বীরত্ব ও সাহসিকতার ব্যাপারে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত আবু বকর (রা.) সাহসিকতা ও বীরত্বের মূর্ত প্রতীক ছিলেন। বড় বড় বিপদকেও তিনি ইসলামের খাতিরে অথবা মহানবী (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা ও প্রেমের কারণে পরোয়াই করতেন না। মক্কার জীবনে যখনই তিনি মহানবী (সা.)-এর সত্তার জন্য কোনো বিপদ বা কষ্টের অবস্থা দেখতেন, তখনই তাঁর (সা.) সুরক্ষা ও সাহায্যের জন্য প্রাচীর হয়ে সামনে দাঁড়িয়ে যেতেন। শে'বে আবি তালেব-এ তিন বছর পর্যন্ত বন্দি ও অবরুদ্ধ থাকার যুগ এলে দৃঢ়তা ও অবিচলতার সাথে সেখানেই উপস্থিত থাকেন। অতঃপর হিজরতের সময় মহানবী (সা.)-এর নৈকট্য ও সঙ্গ লাভের সম্মান লাভ করেন, অথচ এতে প্রাণের আশঙ্কা ছিল। যতগুলো যুদ্ধ হয়েছে সেগুলোতে হযরত আবু বকর (রা.) কেবল অংশগ্রহণই করেন নি বরং মহানবী (সা.)-এর সুরক্ষার দায়িত্বও তিনি পালন করতেন। তাঁর এই সাহসিকতা ও বীরত্বের বিষয়টি দৃষ্টিপটে রেখে হযরত আলী (রা.) একদা লোকদেরকে জিজ্ঞেস করেন, হে লোকেরা! মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বীরপুরুষ কে? মানুষ উত্তরে বলে, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি। হযরত আলী (রা.) বলেন, আমার কথা যদি বল, আমার সাথে যে সম্মুখ-যুদ্ধ করেছে তার সাথে আমি ন্যায়বিচার করেছি, অর্থাৎ তাকে হত্যা করেছি। কিন্তু সবার চেয়ে বীরপুরুষ হলেন হযরত আবু বকর (রা.)। আমরা মহানবী (সা.)-এর জন্য বদরের দিন তাঁবু খাটাই, এরপর আমরা বলি, কে আছে যে মহানবী (সা.)-এর সাথে থাকবে যেন তাঁর (সা.) কাছে কোনো মুশরেক পৌঁছাতে না পারে? আল্লাহ্‌র কসম! তখন মহানবী (সা.)-এর কাছে কেউ যায় নি, কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) নিজ তরবারি উঁচিয়ে মহানবী (সা.)-এর পাশে দাঁড়িয়ে যান। অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.)'র সাথে মোকাবিলা করার পূর্বে কোনো মুশরেকই মহানবী (সা.)-এর কাছে পৌঁছতে পারবে না। অতএব তিনিই হলেন সবার চেয়ে বীরপুরুষ।

অনুরূপভাবে উহুদের যুদ্ধে যখন মহানবী (সা.)-এর শাহাদাতের গুজব ছড়িয়ে পড়ে তখন সর্বপ্রথম হযরত আবু বকর (রা.)-ই ভিড় ঠেলে মহানবী (সা.)-এর কাছে পৌঁছেন। বলা হয়ে থাকে, তখন হুযূর (সা.)-এর কাছে কেবল এগারো জন সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে হযরত আবু বকর, হযরত সা'দ, হযরত তালহা, হযরত যুবায়ের এবং হযরত আবু দুজানা (রা.)'র নামও পাওয়া যায়। উহুদের যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর পাহারায় শিবিরে উপস্থিত কতিপয় নিবেদিতপ্রাণ সাহাবীর মাঝে হযরত আবু বকর (রা.)-ও একজন ছিলেন। খন্দকের যুদ্ধে হযরত আবু বকর (রা.) রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে সাথে ছিলেন এবং পরিখা খননের সময় যারা নিজেদের কাপড়ে মাটি উঠিয়ে দূরে ফেলেছেন তিনি (রা.) তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় প্রাণ বিসর্জনের উদ্দেশ্যে বয়আতকারী লোকদের মাঝে তিনি তো অন্তর্ভুক্ত ছিলেনই, সেইসাথে চুক্তিপত্র লেখার সময়ও হযরত আবু বকর (রা.) যে ঈমানী সাহসিকতা, অবিচলতা, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা এবং আনুগত্য ও রসূলপ্রেমের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন তা হযরত উমর (রা.) তার বাকি জীবনে ভুলতে পারেন নি। তায়েফের যুদ্ধেও হযরত আবু বকর (রা.) অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং তার পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আবু বকর (রা.)-ও অংশ নিয়েছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.)'র এই যুবক ছেলে এ যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। এরপর মহানবী (সা.) যখন ৩০ হাজার সৈন্য নিয়ে তাবুকের যুদ্ধের উদ্দেশ্যে

বের হন তখন মহানবী (সা.) বিভিন্ন সেনাপতি নিযুক্ত করে তাদেরকে পতাকা প্রদান করেন। এ সময় সবচেয়ে বড় পতাকা হযরত আবু বকর (রা.)-কে প্রদান করা হয়েছিল।

হযরত সালামা বিন আকওয়া (রা.) বর্ণনা করেন, আমি মহানবী (সা.)-এর সাহচর্যে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি এবং যেসব যুদ্ধাভিযান মহানবী (সা.) পরিচালনা করেছিলেন সেগুলোর মধ্যে নয়টি যুদ্ধাভিযানে আমি অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছি; এগুলোতে আমাদের সেনাপতি কখনো হযরত আবু বকর (রা.) হতেন, আবার কখনো হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.)। এছাড়া মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর বলতে গেলে পুরো আরবই যখন মুরতাদ হয়ে যায় সেই অবস্থায় হযরত আবু বকর (রা.) যে সাহসিকতা ও বীরত্বের বাস্তব দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন তার কোন তুলনাই নেই। এর বিস্তারিত বিবরণ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, একবার কাফেররা মহানবী (সা.)-এর গলায় পাগড়ির কাপড় পেঁচিয়ে সজোরে টানতে আরম্ভ করে। হযরত আবু বকর (রা.) একথা জানতে পেরে দৌড়ে আসেন এবং সেই কাফেরদের তিনি দূরে সরিয়ে দিয়ে বলেন, হে লোকেরা! তোমাদের কি আল্লাহ্র ভয় নেই? তোমরা একজন মানুষকে কেবল এজন্য মারধোর করছ যে, তিনি বলেন, আল্লাহ্ আমার প্রভু। তিনি তো তোমার কাছে কোনো সম্পত্তি চাচ্ছেন না, তাহলে তোমরা তাকে কেন মারছ? সাহাবীরা বলেন, আমাদের যুগে আমরা হযরত আবু বকর (রা.)-কে সবচেয়ে বেশি সাহসী জ্ঞান করতাম। কেননা শত্রু জানত যে, আমি যদি মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করতে পারি তাহলে ইসলাম শেষ হয়ে যাবে। আর আমরা দেখেছি, হযরত আবু বকর (রা.) সর্বদাই মহানবী (সা.)-এর পাশে দাঁড়াতেন যেন কেউ তাঁর (সা.) ওপর আক্রমণ করলে তিনি (রা.) তাঁর সামনে নিজের বুক পেতে দিতে পারেন। বদরের যুদ্ধের সময় (মুসলমান বাহিনী যখন) কাফেরদের মুখোমুখি হয় তখন সাহাবীরা পরস্পর পরামর্শ করে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জন্য একটি মাচা প্রস্তুত করে দিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল! আপনি এই মাচায় বসে আমাদের সফলতার জন্য দোয়া করুন। শত্রুদের সাথে আমরা নিজেরা লড়াই করব। এরপর তারা বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমরা আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, যদিও আমাদের মাঝে নিষ্ঠা রয়েছে, তথাপি যারা মদীনায় অবস্থান করছে তারা আমাদের চেয়েও বেশি নিষ্ঠাবান ও ঈমানদার। কাফেরদের সাথে যে যুদ্ধ হতে যাচ্ছে তা তারা জানতো না, জানলে তারাও এই যুদ্ধে অবশ্যই অংশ নিত। রীতিমত বদরের যুদ্ধের কথা তারা জানত না, অন্যথায় তারাও অংশগ্রহণ করত। হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আল্লাহ্ না করুন, এ যুদ্ধে যদি আমাদের পরাজয় হয় সেক্ষেত্রে একটি দ্রুতগতির উটনী আপনার কাছে বেঁধে রেখেছি আর হযরত আবু বকর (রা.)-কে আপনার পাশে দাঁড় করিয়ে দিয়েছি। আমাদের মাঝে তার চেয়ে সাহসী ও বীরত্বপূর্ণ লোক আর কাউকে আমরা দেখি না। হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনি অতি দ্রুত আবু বকরের সাথে এই উটনীতে চড়ে মদীনায় যাবেন এবং কাফেরদের সাথে মোকাবিলার জন্য সেখান থেকে এক নতুন সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসবেন যারা আমাদের চেয়েও নিষ্ঠাবান এবং বিশ্বস্ত হবে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এই ঘটনা থেকে অনুমান কর যে, হযরত আবু বকর (রা.) কত বড় আত্মত্যাগী মানুষ ছিলেন!

আরেক স্থানে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, একবার কিছু লোক সাহাবীদের জিজ্ঞেস করে, মহানবী (সা.)-এর যুগে সবচেয়ে বেশি সাহসী ও বীর কে ছিলেন? বর্তমানে

যেভাবে শিয়া ও সুন্নির বিষয়টি রয়েছে ঠিক একইভাবে সে যুগেও যারা পক্ষ অবলম্বন করত তারা তাঁর প্রশংসা বা বন্দনা করত। সাহাবীদের এই প্রশ্ন করা হলে উত্তরে তারা বলেন, আমাদের মাঝে সবচেয়ে বেশি সাহসী ও বীর তাকে জ্ঞান করা হতো যিনি সর্বদা মহানবী (সা.) এর পাশে দণ্ডায়মান থাকতেন। এই সূক্ষ্ম বিষয়টি কেবল একজন যোদ্ধাই বুঝতে পারে, অন্য সাধারণ মানুষ বুঝবে না। যুদ্ধের সঠিক জ্ঞান যে রাখে এবং যুদ্ধের বিপদাপদ সম্পর্কে অবগত, সে-ই অনুমান করতে পারে যে, যেখানে সবচেয়ে বেশি বিপদের আশঙ্কা থাকে সেখানে দাঁড়ানো কতটা সাহস ও বীরত্বের কাজ। তিনি (রা.) বলেন, মূলকথা হলো, যে ব্যক্তি দেশ ও জাতির প্রাণ হয়ে থাকেন শত্রু তাকে হত্যা করতে চায়, যেন তার মৃত্যুর সাথে সমস্ত বিবাদ মিটে যায়। এজন্য যেখানেই এমন ব্যক্তি দণ্ডায়মান হবে সেখানেই শত্রু পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করে আক্রমণ করবে। কোনো জিনিসের প্রাণকেন্দ্রের ওপরই শত্রুরা বেশি আক্রমণ করে আর এমন স্থানে সে ব্যক্তিই দণ্ডায়মান হতে পারে, অর্থাৎ সেই প্রাণকেন্দ্রের সুরক্ষার জন্য সে ব্যক্তিই দণ্ডায়মান হতে পারে যে সবচেয়ে বেশি বীরত্বের অধিকারী এবং সাহসী। এরপর সাহাবীরা বলেন, মহানবী (সা.)-এর পাশে অধিকাংশ সময় আবু বকর (রা.) দাঁড়াতেন আর আমাদের দৃষ্টিতে তিনিই সবচেয়ে বেশি সাহসী ও বীরপুরুষ ছিলেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) সূরা বনী ইসরাঈলের দ্বিতীয় আয়াতের তফসীর বর্ণনা করতে গিয়ে এক স্থানে আরো বলেন, এ বিষয়টিও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ আয়াত থেকে বুঝা যায়, পরিচালক অন্য কেউ ছিলেন আর তাতে যাত্রীর নিজের কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। হিজরতের ঘটনাও এভাবেই ঘটেছে, অর্থাৎ তিনি (সা.) রাতেই বেরিয়েছিলেন আর এই বের হওয়াও নিজের ইচ্ছাধীন ছিল না, বরং তখন তিনি (সা.) বাধ্য হয়ে বের হন যখন কাফেররা তাঁকে হত্যা করার জন্য তাঁর বাড়ি ঘিরে রেখেছিল। অতএব এই সফরে তাঁর (সা.) নিজস্ব কোনো ইচ্ছা ছিল না বরং খোদা তা'লার ইচ্ছাই তাঁকে বাধ্য করেছিল, অর্থাৎ তাঁকে যিনি পরিচালনা করেছেন, তাঁকে যিনি বের করেছেন এবং তাঁকে যিনি হিজরত করতে বলেছেন তিনি হলেন স্বয়ং আল্লাহ্, আর তাঁর ইচ্ছার জন্যই তিনি (সা.) বাধ্য হয়ে বের হয়েছিলেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, অপরদিকে যেভাবে স্বপ্নে জিব্রাঈল বায়তুল মুকাদ্দাসের সফরে তাঁর (সা.) সাথে ছিলেন তেমনিভাবে আবু বকর (রা.) হিজরতে তাঁর (সা.) সাথে ছিলেন। তিনি (রা.) বলতে গেলে সেভাবেই তাঁর অনুগত ছিলেন যেভাবে জিব্রাঈল আল্লাহ্ তা'লার অনুগত হয়ে কাজ করেন। এছাড়া জিব্রাঈলের অর্থ খোদা তা'লার পালোয়ান বা বীর। হযরত আবু বকর (রা.)-ও আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ বান্দা ছিলেন এবং ধর্মের খাতিরে এক নির্ভীক বীরের মর্যাদা রাখতেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) আরেক স্থানে বলেন, প্রকৃত বিষয় হলো, আল্লাহ্ তা'লার কালাম তথা বাণীর প্রতি ঈমান থাকা অবস্থায় মানব হৃদয়ে নৈরাশ্য সৃষ্টিই হতে পারে না। আল্লাহ্ তা'লার প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান থাকলে হৃদয়ে কোনো নৈরাশ্য সৃষ্টি হতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ সওর গুহায় মহানবী (সা.)-এর যে অবস্থা হয়েছিল সেখানে আর কোন্ আশার আলো অবশিষ্ট ছিল? মহানবী (সা.) রাতের আঁধারে নিজ বাড়ি ছেড়ে সওর গুহায় গিয়ে লুকিয়ে থাকেন। এমন একটি গুহা যার মুখ বেশ প্রশস্ত ও খোলা ছিল আর যেকোন মানুষ সহজেই এর ভেতরে উঁকি দিতে পারত এবং লাফিয়ে পড়তে পারত। কেবলমাত্র একজন সাথি তাঁর সাথে ছিল এবং তাঁরা উভয়েই ছিলেন নিরস্ত্র ও বলহীন। মক্কার অস্ত্রধারী লোকেরা তাঁর (সা.) পশ্চাদ্ধাবন করে সওর গুহায় পৌঁছে আর তাদের কেউ কেউ জোরাজুরি করে বলেছে, আমাদের উঁকি দিয়ে হলেও ভিতরে একবার

দেখে নেয়া উচিত যেন এর ভিতরে তারা থাকলে আমরা তাদের পাকড়াও করতে পারি। শত্রুকে এত কাছে দেখে হযরত আবু বকর (রা.) কেঁদে ফেলেন আর তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! শত্রু তো আমাদের নাকের ডগায় পৌঁছে গেছে। তিনি (সা.) তখন অত্যন্ত প্রতাপের সাথে বলেন, لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا (সূরা তওবা : ৪০) অর্থাৎ হে আবু বকর! তুমি ভয় পাচ্ছ কেন? আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন। দেখুন, তিনি কীরূপ চরম বিপদসংকুল পরিস্থিতির সম্মুখীন ছিলেন! আর এ ঘটনার পর মহানবী (সা.)-কে হত্যা বা গ্রেফতার করার চেষ্টায় আর কী ত্রুটি অবশিষ্ট ছিল? কিন্তু যদিও শত্রু শক্তিধর ছিল, সৈন্যসামন্ত তাদের সাথে ছিল এবং তাদের কাছে অস্ত্রসস্ত্র ছিল, অথচ মহানবী (সা.) ছিলেন একেবারে নিরস্ত্র আর কেবল একজন সাথি নিয়ে গুহায় বসে ছিলেন; তাঁর সাথে অস্ত্র ছিল না, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা তাঁর পক্ষে ছিল না আর কোনো লোকবলও তাঁর সাথে ছিল না; বহু সংখ্যক শত্রুকে কাছেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেও তিনি (সা.) বলেন, لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا তুমি কেন একথা বলছ যে, শত্রু শক্তিধর? তারা কি খোদার চেয়ে অধিক শক্তিধর? যেখানে খোদা তা'লা আমাদের সাথে আছেন তখন আমাদের ভয়ের কী কারণ আছে? হযরত আবু বকর (রা.)'র ভীতিও নিজের জন্য ছিল না, বরং মহানবী (সা.)-এর জন্য ছিল। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, কতক শিয়া এই ঘটনা উপস্থাপন করে বলে, [নাউযুবিল্লাহ্,] আবু বকরের ঈমান ছিল না; সে নিজ প্রাণ বিসর্জন দিতে ভয় পেয়েছিল। অথচ ইতিহাসে সুস্পষ্টভাবে লেখা আছে যে, মহানবী (সা.) যখন বলেন, لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا তখন হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি নিজ প্রাণের জন্য ভীত নই। আমি যদি মারা যাই তবে কেবল একজন ব্যক্তি মারা যাবে; আমি তো আপনার প্রাণ নিয়ে শঙ্কিত, কেননা আপনার কোনো ক্ষতি হলে জগত থেকে সততা বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

অপর একস্থানে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এ বিষয়টি কেবল নবীদের জন্য নির্দিষ্ট নয় বরং এর বাইরেও বিভিন্ন যুগে এমন লোক দেখা যায়, যারা নিজ নিজ যুগে এমন কাজ করেছেন যা তারা ছাড়া অন্য কেউ করতে পারত না। যেমন, হযরত আবু বকর (রা.)'র কথাই ধরুন। হযরত আবু বকর (রা.)'র ব্যাপারে কেউ একথা চিন্তাও করত না যে, তিনিও কোনো এক যুগে নিজ জাতির নেতৃত্ব দেবেন। সাধারণত এটিই মনে করা হতো যে, তিনি দুর্বল প্রকৃতির, শান্তিপ্রিয় এবং কোমল স্বভাবের মানুষ। মহানবী (সা.)-এর যুগের যুদ্ধগুলোকেই দেখুন। তিনি (সা.) কোনো বড় যুদ্ধেই হযরত আবু বকর (রা.)-কে সেনাদলের সেনাপতি নিযুক্ত করেন নি। নিঃসন্দেহে কতক এমন ছোট ছোট যুদ্ধাভিযান ছিল যেগুলোতে তাঁকে নেতৃত্ব দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে, কিন্তু বড় বড় যুদ্ধে সব সময়ই অন্যদেরকে সেনাপতি করে প্রেরণ করা হতো। অনুরূপভাবে অন্যান্য কাজের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বও তাঁর হাতে ন্যস্ত করা হতো না। বাকি থাকল পবিত্র কুরআন শেখানো বা বিচার বিষয়ক কাজ– এগুলোর দায়িত্বও তাঁর স্কন্ধে অর্পণ করা হয় নি। [অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.)'র স্কন্ধে অর্পণ করা হয় নি।] কিন্তু মহানবী (সা.) জানতেন, যখন হযরত আবু বকর (রা.)'র যুগ আসবে, তখন যে কাজ হযরত আবু বকর (রা.) করতে পারবেন তা তিনি (রা.) ছাড়া অন্য কেউ করতে পারবে না। অতএব মহানবী (সা.) যখন মৃত্যুবরণ করেন এবং মুসলমানদের মাঝে মতবিরোধ দেখা দেয় যে, কে খলীফা হবে– তখন হযরত আবু বকর (রা.)'র মাথায়ও এ বিষয়টি ছিল না যে, তিনিই খলীফা হবেন। তিনি (রা.) মনে করতেন, হযরত উমর প্রমুখই (খিলাফত)-এর যোগ্য বা তারাই খলীফা হতে পারেন। কিন্তু আনসারের মাঝে যখন উত্তেজনা

সৃষ্টি হয় এবং তারা চান, খিলাফত যেন তাদের মাঝেই থাকে; কেননা তারা মনে করতেন, আমরা ইসলামের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেছি এবং এখন খিলাফতের অধিকার (আনসাররা মনে করতেন) আমাদের; অপরদিকে মুহাজেররা বলছিলেন, খলীফা আমাদের মধ্য থেকে হবে। মোটকথা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মৃত্যুতে একটি বিবাদের সৃষ্টি হয়। আনসাররা বলছিলেন, খলীফা আমাদের মধ্য থেকে হবে আর মুহাজেররা বলছিলেন, খলীফা আমাদের মধ্য থেকে হবে। অবশেষে বিতর্কের অবসানের লক্ষ্যে আনসারের পক্ষ থেকে এ প্রস্তাব উত্থাপিত হয় যে, একজন খলীফা মুহাজেরদের মধ্য থেকে হোক এবং একজন খলীফা আনসারের মধ্য থেকে হোক। এই বিতর্কের অবসানের জন্য একটি সভা আহ্বান করা হয়। হযরত উমর (রা.) বলেন, তখন আমি ভাবলাম, নিঃসন্দেহে আবু বকর (রা.) অত্যন্ত পুণ্যবান ও বুযুর্গ ব্যক্তি, কিন্তু এই কঠিন সমস্যার সমাধান করা তাঁর কাজ নয়, এটি তাঁর পক্ষে অত্যন্ত কঠিন কাজ। হযরত উমর (রা.) ভাবেন, এই কঠিন সমস্যার সমাধান করা যদি কারো পক্ষে সম্ভবপর হয় তবে আমিই সেই ব্যক্তি। এখানে বল প্রয়োগ করা আবশ্যক, নম্রতা ও ভালোবাসা দিয়ে কাজ হবে না। হযরত আবু বকর (রা.) তো নম্রতা ও ভালোবাসা দেখানোর মানুষ। তাই তিনি বলেন, আমি ভেবেচিন্তে এমন সব যুক্তিপ্রমাণ বের করতে আরম্ভ করি যেগুলো দ্বারা একথা সাব্যস্ত হবে যে, খলীফা কুরাইশদের মধ্য থেকেই হওয়া উচিত। অপরদিকে একজন খলীফা আনসারদের মধ্য থেকে হোক এবং একজন মুহাজেরদের মধ্য থেকে হোক– এটি সম্পূর্ণ ভুল (প্রস্তাব)। তিনি বলেন, আমি অনেক যুক্তিপ্রমাণ ভেবে বের করি, তারপর সেই সভায় যাই যা এই বিতর্কের অবসানের জন্য আয়োজন করা হয়েছিল। হযরত আবু বকর (রা.)-ও আমার সাথে ছিলেন। আমি ভাবছিলাম যে, আমি বক্তৃতা দেব এবং যেসব যুক্তিপ্রমাণ আমি ভেবে রেখেছি সেগুলো দিয়ে লোকজনকে আমার সাথে সহমত করে নেব। আমি ভাবতাম, এই সভায় বক্তব্য রাখার মত যথেষ্ট প্রভাব ও প্রতাপের অধিকারী হযরত আবু বকর (রা.) নন। হযরত উমর (রা.) বলেন, কিন্তু যেই না আমি উঠে দাঁড়াতে যাব, ঠিক তখনই হযরত আবু বকর (রা.) কিছুটা রাগের সাথে করাঘাত করে আমাকে বলেন, বসে পড়! আর তিনি স্বয়ং দাঁড়িয়ে বক্তৃতা আরম্ভ করেন। হযরত উমর (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি যতগুলো যুক্তিপ্রামাণ ভেবেছিলাম সেগুলোর সবই হযরত আবু বকর (রা.) বর্ণনা করেন, আর এছাড়াও আরো অনেক যুক্তিপ্রমাণ তুলে ধরতে থাকেন এবং এভাবে বলতেই থাকেন। এভাবে এক পর্যায়ে আনসাদের হৃদয় প্রশান্ত হয় এবং তারা মুহাজেরদের খিলাফতের নীতি মেনে নেন। ইনিই সেই আবু বকর (রা.) ছিলেন যাঁর সম্পর্কে হযরত উমর (রা.) স্বয়ং বর্ণনা করেছেন, তিনি একবার কোনো বিবাদের সময় বাজারে হযরত আবু বকর (রা.)'র কাপড় ছিঁড়ে ফেলেছিলেন এবং তাঁর গায়ে হাত তুলতে উদ্যত হয়েছিলেন। ইনিই সেই আবু বকর (রা.) যাঁর সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলতেন, আবু বকরের হৃদয় খুবই কোমল। কিন্তু যখন রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হয় তখন মৃত্যুর পূর্বে মহানবী (সা.) হযরত আয়েশা (রা.)-কে বলেন, আমার মনে বার বার এই ইচ্ছা জাগে যে, লোকজনকে বলে দিই, তারা যেন আমার (মৃত্যুর) পর আবু বকরকে খলীফা বানায়; কিন্তু আবার আমি থেমে যাই কারণ আমার মন জানে, আমার মৃত্যুর পর খোদা তা'লা এবং তাঁর মু'মিন বান্দারা আবু বকর ছাড়া অন্য কাউকে খলীফা বানাবেন না।

বাস্তবে এমনটিই হয়েছে, তাঁকে খলীফা নির্বাচিত করা হয়। তিনি অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের মানুষ ছিলেন এবং এতটা নম্র স্বভাবের ছিলেন যে, একদা হযরত উমর (রা.) তাঁকে

বাজারের ভেতর মারতে উদ্যত হয়েছিলেন এবং তাঁর কাপড় তিনি ছিঁড়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু সেই আবু বকর (রা.)-ই যাঁর নম্রতার এরূপ অবস্থা ছিল, এমন এক যুগ আসে যখন হযরত উমর (রা.) তাঁর কাছে গিয়ে অনুরোধ করেন, সমগ্র আরব এখন বিরোধী হয়ে গিয়েছে; শুধুমাত্র মদীনা, মক্কা ও আরেকটি ছোট জনপদে বাজামা'ত নামায পড়া হয়, বাকি সবাই নামায পড়লেও তাদের মধ্যে এতটা বিভেদ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে যে, একজন আরেকজনের পেছনে নামায পড়তে প্রস্তুত নয়। এছাড়া মতবিরোধ এতটা বেড়ে গেছে যে, তারা কারো কথা মানতে প্রস্তুত নয়। আরবের মূর্খ লোকেরা যারা মাত্র পাঁচ-ছয়মাস পূর্বে মুসলমান হয়েছে তারা দাবি করছে যে, যাকাত মওকুফ করে দেয়া হোক। হযরত উমর (রা.) বলেন, এসব মানুষ যাকাতের বিষয়টি ভালোভাবে বুঝেও না, তাই এক-দুই বছর তাদের যাকাত মওকুফ করে দেয়া হলে তাতে সমস্যা কোথায়? সেই উমর (রা.) যিনি সর্বদা তরবারি হাতে দণ্ডায়মান থাকতেন এবং ছোটোখাটো বিষয়েও বলতেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! অনুমতি পেলে তার শিরোশ্ছেদ করে দেব– তিনি তাদের দ্বারা এতটা প্রভাবিত হন এবং এতটা ভীত ও সন্ত্রস্ত হন যে, আবু বকর (রা.)'র নিকট এসে তাঁর কাছে নিবেদন করেন, এসব অজ্ঞ লোকের যাকাত কিছু দিনের জন্য ক্ষমা করে দেয়া হোক; আমরা ধীরে ধীরে তাদের বুঝিয়ে নেব। কিন্তু সেই আবু বকর (রা.) যিনি এতটা কোমল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন যে হযরত উমর (রা.) বলেন, একবার আমি তাকে মারতে উদ্যত হয়েছিলাম এবং বাজারের মধ্যে তাঁর জামা ছিঁড়ে ফেলেছিলাম; তিনি (রা.) তখন অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে উমরের দিকে তাকান, [অর্থাৎ হযরত উমর (রা.) যখন একথা বলেন যে, যারা বিদ্রোহ করছে তাদের যেন কিছু না বলা হয়, দুই বছর পর্যন্ত যেন তাদের কাছ থেকে যাকাত না নেয়া হয়; পরবর্তীতে আমরা তাদের বুঝিয়ে নেব।] হযরত উমর (রা.) যখন এ বিষয়ে কথা বলেন তখন হযরত আবু বকর (রা.) অত্যন্ত রাগত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে বলেন, উমর! তুমি সেই বিষয়ের দাবি করছ যা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল করেন নি। হযরত উমর (রা.) বলেন, একথা ঠিক, কিন্তু এরা এক কথার মানুষ। শত্রুসেনা মদীনার সীমানায় পৌঁছে গেছে। এসব লোক আরো এগিয়ে আসুক এবং দেশের মধ্যে আবারও নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হোক– এটি কি ঠিক হবে, নাকি তাদের যাকত এক-দুই বছরের জন্য মাফ করে দেয়া সঙ্গত হবে? নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি নাকি কোনোভাবে সন্ধি করে নেয়া সঠিক হবে? হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! শত্রুরা যদি মদীনার ভেতর ঢুকে যায় এবং এর অলিগলিতে মুসলমানদেরকে নির্বিচারে হত্যা করা হয় আর মহিলাদের লাশগুলোকে কুকুর টানাহেঁচড়া করে, তবুও আমি তাদের যাকাত মাফ করব না। খোদার কসম! রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যুগে এরা যদি যাকাত হিসেবে রশির একটি টুকরোও প্রদান করে থাকে তাহলে আমি তা-ও তাদের কাছ থেকে নিয়ে ছাড়ব। এরপর তিনি (রা.) বলেন, হে উমর! তোমরা যদি ভয় পাও তবে নিঃসন্দেহে চলে যাও। আমি একাই তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব আর ততক্ষণ পর্যন্ত থামব না যতক্ষণ না তারা তাদের দুষ্কৃতি থেকে নিবৃত্ত হবে। অতএব যুদ্ধ হয় এবং তিনি, অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.) জয়ী হন আর নিজ মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বেই তিনি পুনরায় সমগ্র আরবকে নিজের অধীনস্থ করে নেন। হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর জীবনে যেসব কাজ করেছেন তা তাঁরই ভাগ্যে ছিল, অন্য কেউই সেই কাজ করতে পারত না।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, জনসাধারণের কাছে মক্কার সর্দারদের এতটা সম্মান ও মর্যাদা ছিল যে, সাধারণ মানুষ তাদের সম্মুখে কথা বলতেও ভয় পেত। এছাড়া

জনসাধারণের প্রতি তাদের অনুগ্রহও এত অধিক পরিমাণে ছিল যে, কোনো ব্যক্তি তাদের সম্মুখে চোখ তুলেও তাকাতে পারত না। তাদের প্রতাপ সম্পর্কে তখন বুঝা যায় যখন হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় মক্কাবাসী যে সর্দারকে মহানবী (সা.)-এর সাথে আলোচনা করতে পাঠিয়েছিল সে কথা বলতে বলতে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পবিত্র দাড়িতে হাত দেয়। এ দৃশ্য দেখে একজন সাহাবী তার তরবারির বাট, অর্থাৎ তরবারির হাতল দিয়ে সজোরে তার হাতে আঘাত করে বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পবিত্র দাড়ি তোমার অপবিত্র হাত দিয়ে স্পর্শ করবে না। সে চোখ তুলে দেখে যেন সে চিনতে পারে যে, কে এই ব্যক্তি যে আমার হাতে তরবারির হাতল দিয়ে আঘাত করেছে। সাহাবা (রা.) যেহেতু শিরোস্ত্রাণ পরিহিত ছিলেন এজন্য তাদের কেবল চোখ এবং এর আশপাশ দেখা যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ গভীরভাবে দেখার পর সে বলে ওঠে, তুমি কি অমুক ব্যক্তি? তিনি বলেন, হ্যাঁ। সে বলে, তুমি কি জান না যে, অমুক অমুক সময়ে আমি তোমার পরিবারকে অমুক বিপদ থেকে উদ্ধার করেছি এবং অমুক সময়ে তোমার প্রতি অমুক অনুগ্রহ করেছি? (এরপরও) তুমি আমার সম্মুখে কথা বলার ধৃষ্টতা দেখাও? হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, আমরা যদি আজকাল লক্ষ্য করি তাহলে অকৃতজ্ঞতার বৈশিষ্ট্য মানুষের মাঝে এতটা বিস্তার লাভ করেছে যে, সন্ধ্যায় কারো প্রতি কোনো অনুগ্রহ করলে সকালেই সে তা ভুলে যায় আর বলে, এখন কি আমি সারা জীবন তার গোলাম হয়ে থাকব? আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছে তো কী হয়েছে? সারা জীবনের গোলামী তো দূরের কথা, অনুগ্রহের জন্য এক রাত কৃতজ্ঞ হওয়াই দুষ্কর। কিন্তু আরবদের মাঝে চরম পর্যায়ের কৃতজ্ঞতাবোধের চেতনা পাওয়া যেত। এটি একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর সময় ছিল, কিন্তু সে যখন তার প্রতি করা অনুগ্রহের তালিকা বর্ণনা করে তখন সেই সাহাবীর দৃষ্টি নীচু হয়ে যায় এবং তিনি লজ্জিত হয়ে পেছনে চলে যান। [তখন এত বেশি অনুগ্রহের মূল্যায়ন করা হতো।] ফলে সে আবার মহানবী (সা.)-এর সাথে কথা বলতে আরম্ভ করে আর বলে, আমি আরবের পিতা! আমি তোমার কাছে মিনতি করছি যে, তুমি তোমার জাতির সম্মান রক্ষা কর। আর দেখ! তোমার আশেপাশে যারা সমবেত রয়েছে তারা তো বিপদের সময় তাৎক্ষণিকভাবে পলায়ন করবে। তোমার জাতিই শেষ পর্যন্ত তোমার উপকারে আসবে। অতএব নিজ জাতিকে লাঞ্ছিত করছ কেন? আমি আরবের পিতা। সেই ব্যক্তি মহানবী (সা.)-কে বার বার একথাই বলছিল যে, আমি আরবের পিতা, তুমি আমার কথা মেনে নাও আর আমার কথা মতো উমরা না করেই ফিরে চলে যাও। এরই মাঝে সে তার কথায় জোর দিতে এবং মহানবী (সা.)-কে দিয়ে (কথা) মানানোর জন্য তাঁর পবিত্র দাড়িতে আবার হাত দেয়। যদিও তাঁর পবিত্র দাড়িতে তার হাত লাগানো নিবেদনস্বরূপ ছিল, অর্থাৎ অত্যন্ত মিনতির সুরে বলতে চাচ্ছিল আর এজন্য তা করছিল যেন তাঁকে দিয়ে নিজের কথা মানাতে পারে। কিন্তু এতে যেহেতু অসম্মানের দিকও নিহিত ছিল, তাই সাহাবীরা (রা.) এটি সহ্য করতে পারেন নি। আর যখনই সে মহানবী (সা.)-এর দাড়িতে হাত দিয়েছে তখনই কোনো এক ব্যক্তি নিজ হাত দিয়ে তার হাতে (ধাক্কা) মেরে বলেন, (সাবধান!) তোমার নোংরা হাত রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পবিত্র দাড়ির দিকে বাড়াবে না। সে আবার চোখ তুলে গভীরভাবে দেখতে থাকে যে, কে সেই ব্যক্তি যে আমাকে বাধা দিয়েছে? অবশেষে সে তাকে চিনতে পেরে নিজের দৃষ্টি অবনত করে নেয়। কাফেরদের প্রতিনিধি হয়ে যে ব্যক্তি এসেছিল সে ওই ব্যক্তিকে চেনার পর দৃষ্টি অবনত করে ফেলে। সে দেখে, ইনি তো আবু

বকর (রা.); আর সে বলে ওঠে, হে আবু বকর! আমি জানি, তোমার প্রতি আমার কোনো অনুগ্রহ নেই। তুমিই এমন একজন মানুষ যার প্রতি আমার কোনো অনুগ্রহ নেই।

অতএব তারা অন্যদের প্রতি অনুগ্রহকারী এমন এক জাতি ছিল যারা হযরত আবু বকর (রা.) ব্যতীত যতজন আনসার ও মুহাজের সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাদের সবার ওপর এক গোত্রপতির কোনো না কোনো অনুগ্রহ ছিল, আর হযরত আবু বকর (রা.) ব্যতীত অন্য কারো এমন সাহস ছিল না যে, তার হাতকে প্রতিহত করতে পারে। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন যার প্রতি তার কোনো অনুগ্রহ ছিল না।

পুনরায় আরেক স্থানে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, যাকাত এমন একটি আবশ্যক বিষয় যে, কেউ না দিলে সে ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত হয়ে যায়। মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর হযরত আবু বকর (রা.)'র যুগে কিছু লোক যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলে خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ (সূরা তওবা : ১০৩)– এ আয়াতে তো মহানবী (সা.)-কে বলা হয়েছে, তুমি নাও। এখন যেহেতু মহানবী (সা.) আর বর্তমান নেই তখন আর কে (এটি) নিতে পারে? অজ্ঞরা এটি বুঝতে পারে নি যে, যিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর স্থলাভিষিক্ত হবেন তিনি (তা) নেবেন। কিন্তু অজ্ঞতাবশত তারা বলে দিয়েছে, আমরা যাকাত দেব না। একদিকে লোকেরা যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, অন্যদিকে নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়ে গেছে। প্রায় সমগ্র আরব মুরতাদ তথা ধর্মত্যাগী হয়ে গেছে এবং কয়েকজন নবীর দাবিদার দাঁড়িয়ে গেছে। এরূপ অনুভূত হচ্ছিল যেন (নাউযুবিল্লাহ্) ইসলাম ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হয়ে গেছে। এমন স্পর্শকাতর সময়ে সাহাবীরা হযরত আবু বকর (রা.)-কে বলেন, যারা যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে আপনি তাদের সাথে বর্তমান পরিস্থিতিতে নমনীয় আচরণ করুন। হযরত উমর (রা.) যাকে অনেক সাহসী আখ্যা দেয়া হয় তিনি বলেন, আমি যত বড় বীরই হই না কেন, আবু বকর (রা.)'র মত নই। কেননা আমিও তখন একথাই বলেছিলাম যে, তাদের সাথে নম্রতা প্রদর্শন করা হোক; প্রথমে কাফেরদের নিধন করে তারপর তাদের সংশোধন করব। কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আবু কাহাফার পুত্রের ধৃষ্টতা কোথায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রবর্তিত নির্দেশ পরিবর্তন করবে! আমি তো এসব লোকের সাথে ততক্ষণ লড়াই করব যতক্ষণ তারা পূর্ণ হারে যাকাত না দেবে এবং মহানবী (সা.)-এর যুগে উঁট বাঁধার একটি রশি দিয়ে থাকলে তা-ও না দেবে বা আদায় করবে। তখন সাহাবীরা বুঝতে পারেন, খোদার মনোনীত খলীফা কতটা সাহস এবং বীরত্বের অধিকারী হন। পরিশেষে হযরত আবু বকর (রা.) তাদের অধীনস্থ করেন এবং তাদের কাছ থেকে যাকাত নিয়ে ছাড়েন।

হযরত আবু বকর (রা.)'র আর্থিক কুরবানী সম্পর্কে জনৈক লেখক লেখেন, হযরত আবু বকর (রা.) যখন মুসলমান হন তখন তাঁর কাছে ৪০ হাজার দিরহামের মোটা অঙ্কের অর্থ জমা ছিল; আর এটি জানা কথা যে, ব্যবসায়িক মূলধন তথা উপকরণ ও দ্রব্যসামগ্রী এর বাইরে ছিল। বরং একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী তাঁর কাছে এক মিলিয়ন, অর্থাৎ দশ লক্ষ দিরহাম জমা ছিল। তিনি মক্কায় সাধারণ মুসলমানদের সাহায্য-সহযোগিতায় এবং দরিদ্র মুসলমানদের ভরণপোষণের জন্য হাজার হাজার দিরহাম ব্যয় করেন। তথাপি তিনি যখন হিজরত করেন তখন তাঁর সাথে নগদ পাঁচ-ছয় হাজার দিরহাম ছিল। একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী, তিনি (রা.) এই সমস্ত অর্থ মহানবী (সা.)-এর প্রয়োজন মেটানোর জন্য জমা করে রাখছিলেন এবং হিজরতের সময় মদীনায় নিয়ে এসেছিলেন। এই অর্থ দিয়েই তিনি (রা.)

হিজরতের সময় সফরের ব্যয় নির্বাহ করা ছাড়াও হিজরতের পর মহানবী (সা.)-এর পরিবারের কতক সদস্যের সফরের খরচ হিসেবে দিয়েছিলেন এবং মদীনায় মুসলমানদের জন্য কিছু জমিও ক্রয় করেছিলেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, যে অসুস্থতায় মহানবী (সা.)-এর মৃত্যু হয় সেই অন্তিম অসুস্থতার সময় তিনি (সা.) বাইরে বেরিয়ে আসেন আর তিনি (সা.) তাঁর মাথা একটি কাপড় দিয়ে বেঁধে রেখেছিলেন। তিনি (সা.) মিম্বরে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণকীর্তন করার পর বলেন, লোকদের মাঝে এমন কেউ নেই যে তার নিজ জীবন ও সম্পদের মাধ্যমে আমার সাথে আবু বকর বিন আবু কাহাফার চেয়ে অধিক উত্তম আচরণ করেছে।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, কোনো সম্পদই আমার ততটা উপকার সাধন করে নি যতটা উপকার করেছে আবু বকরের সম্পদ। রেওয়ায়াতকারী বলেন, হযরত আবু বকর (রা.) একথা শুনে কেঁদে ফেলেন এবং নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি এবং আমার সম্পদ তো কেবল আপনার জন্যই নিবেদিত।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন,

এক যুদ্ধকালীন সময় সম্পর্কে হযরত উমর (রা.) বলেন, আমার মনে হলো, হযরত আবু বকর (রা.) সর্বদা আমার চেয়ে এগিয়ে থাকেন, আজ আমি তার চেয়ে এগিয়ে যাব। একথা ভেবে আমি বাড়িতে যাই এবং আমার (সমস্ত) ধনসম্পদের অর্ধেকটা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সমীপে উপস্থাপন করার জন্য নিয়ে আসি। সেই যুগ ইসলামের জন্য সীমাহীন কষ্টের যুগ ছিল, কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর সমস্ত ধনসম্পদ নিয়ে হাজির হন। একস্থানে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত আবু বকর (রা.) নিজের যাবতীয় মালামাল এমনকি লেপ এবং চৌকি পর্যন্ত নিয়ে এসে মহানবী (সা.)-এর সমীপে সব জিনিস উপস্থাপন করেন। মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন, আবু বকর! ঘরে কী রেখে এসেছ? তিনি (রা.) নিবেদন করেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-কে। হযরত উমর (রা.) বলেন, একথা শুনে আমি ভীষণ লজ্জিত হই এবং আমি বুঝতে পারি, আজ আমি আপ্রাণ চেষ্টা করে হযরত আবু বকর (রা.)'র চেয়ে অগ্রগামী হতে চেয়েছি, কিন্তু আজও আবু বকর এগিয়ে রইলেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, কেউ বলতে পারে, হযরত আবু বকর (রা.) যখন তাঁর যাবতীয় সম্পদ নিয়ে উপস্থিত হন তখন বাড়ির লোকদের জন্য তিনি কী রেখে এসেছিলেন? এ প্রসঙ্গে জেনে রাখা উচিত, এর অর্থ হলো ঘরে সঞ্চিত সমস্ত সম্পদ। তিনি ব্যবসায়ী ছিলেন, ব্যবসায় যে সম্পদ লগ্নি করা ছিল তা নিয়ে আসেন নি আর বাড়িঘর বিক্রি করেও নিয়ে আসেন নি, বরং তিনি (রা.) ঘরের জিনিসপত্র নিয়ে এসেছিলেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এ ঘটনা থেকে হযরত আবু বকর (রা.)'র দুটি শ্রেষ্ঠত্ব প্রতীয়মান হয়। একটি হলো তিনি (রা.) সর্বাধিক কুরবানী করেছেন, আর দ্বিতীয়টি হলো নিজের সমস্ত সম্পদ নিয়ে আসা সত্ত্বেও সবার আগে পৌঁছে গেছেন। যারা অল্প দিয়েছিল তারা এ চিন্তায় ব্যস্ত ছিল যে, ঘরে কতটুকু রাখবে আর কতটুকু আনবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও হযরত আবু বকর (রা.) সম্পর্কে কোথাও এর উল্লেখ নেই যে, তিনি অন্যের বিরুদ্ধে আপত্তি করেছেন। সব কিছু নিয়ে এসেছেন কিন্তু এমনটি হয় নি যে, আপত্তি করে বলেছেন, দেখ! আমি নিয়ে এসেছি, কিন্তু অন্যরা (এখনো) আনে না। হযরত আবু বকর (রা.) কুরবানী করার পরও মনে করতেন, এখনো আমি খোদার

কাছে ঋণী। আমি আল্লাহ্‌র প্রতি কোনো অনুগ্রহ করি নি, বরং আমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ হলো তিনি আমাকে তৌফিক দিয়েছেন। অতএব হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে বলছেন, যারা আর্থিক কুরবানী করেন তাদের নিজেদের প্রতি দৃষ্টি দেয়া উচিত, আর সেই মুনাফিকদের মতো হওয়া উচিত নয় যারা নিজেরাও চাঁদা দেয় না, আর সামান্য কিছু দিলেও অন্যের বিরুদ্ধে আপত্তি করে বলে, দেখ! অমুক কম দিয়েছে, অমুক এত দিয়েছে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, সাহাবীদের সেই পবিত্র জামা'ত ছিল যাদের প্রশংসায় পবিত্র কুরআন পঞ্চমুখ। আপনারা কি এমন? অথচ খোদা বলেন, হযরত মসীহ্‌র সাথে সেসব লোক থাকবেন যারা সাহাবীদের অনুরূপ হবেন। সাহাবীরা তো এমন মানুষ ছিলেন যারা তাদের সম্পদ ও দেশকে সত্যের পথে উৎসর্গ করেছেন। সব কিছু বিসর্জন দিয়েছেন। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.)'র বিষয়টি অনেকবারই শুনে থাকবে, একবার আল্লাহ্‌র পথে আর্থিক কুরবানী করার নির্দেশ হলে তিনি (রা.) ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে আসেন। মহানবী (সা.) যখন জিজ্ঞেস করেন, ঘরে কী রেখে এসেছেন? তখন উত্তরে তিনি (রা.) বলেন, খোদা ও তাঁর রসূলকে রেখে এসেছি? মক্কার নেতা হয়েও (যখন) কম্বল পরিহিত দরিদ্রদের পোশাক পরিধান করেছেন (তখন) বুঝে নিও, এসব লোক তো খোদার পথে শহীদ হয়ে গেছেন। তাদের জন্য লেখা আছে, তরবারির নীচে জান্নাত।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরো বলেন, সাহাবীদের অবস্থা দেখ! পরীক্ষার সময় এলে যার কাছে যা কিছু ছিল আল্লাহ্‌র পথে উৎসর্গ করেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) সবার আগে কম্বল পরিধান করে চলে আসেন। কিন্তু এই কম্বলের প্রতিদান আল্লাহ্ তা'লা কী দিয়েছেন? অর্থাৎ সবকিছু নিয়ে আসেন আর গায়ে শুধু একটি কম্বল জড়িয়ে নেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে কী প্রতিদান দিয়েছেন? সর্বপ্রথম খলীফা তিনিই হন। মোটকথা, এটিই প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্ব; [অর্থাৎ সর্বপ্রথম কাজ করা।] তিনি (আ.) বলেন, কল্যাণ ও আত্মিক তৃপ্তি লাভের জন্য সেই সম্পদই কাজে লাগে যা খোদার পথে ব্যয় করা হয়। বাকি স্মৃতিচারণ আগামীতে হবে, ইনশাআল্লাহ্।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)